স্পট :

ঐতিহ্য ও প্রাচীন স্থাপত্যের অতীশ দীপংকরের বজ্রযোগিনী

লিখেছেন পারভীন তানী ও সাজিয়া আফরিন

সকাল ৭.০০ : মুক্তারপুর ফেরিঘাট। ধলেশ্বরী নদীর ওপর দিয়ে ফেরি পার হতে হয়। ঢাকা থেকে মাত্র দেড় ঘন্টার পথ এই ফেরিঘাট। রোদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে নদীর পানি। ফেরির কর্মচারী আবুল খায়ের জানালো, এই নদীতে এখনো শুশুক দেখা যায়। ডলফিনের মতো দেখতে এই শুশুক। আগে ফেরির আশপাশেই শুশুক লাফালাফি করতো। কিন্তু এখন অনেক কমে যাওয়ায় গভীর নদী ছাড়া এদের দেখা যায় না।

৭.৩০ : মুন্সিগঞ্জ থানার বজ্রযোগিনী গ্রাম। চারদিকে পাখির ডাকাডাকি। সবজির ঝুড়ি মাথায় বাজারে যাচ্ছে চাষী! বজ্রযোগিনী গ্রামের মূল রাস্তা পাকা। রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের সারি। গাছের ছায়া আর বাতাস মিলে এই তীব্র গরমেও পরিবেশ শীতল করে রেখেছে।

গ্রামে ঢোকার মুখেই বাজার। এই সকালেই বাজার জমজমাট। ঝুড়ি ভরে তাজা সবজি নিয়ে এসেছে সবাই। বাজারে একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞাস করে জানা যায়, এই গ্রামে কোনো হাট বসে না। কারণ প্রতিদিনই বাজারে আনা হয় ক্ষেতের সবজি। এই গ্রামের মানুষ প্রতিদিন টাটকা সবজি আর মাছ কেনে বাজার থেকে। বাজারটা তিনটি রাস্তার মধ্যে। একটা রাস্তা চলে গেছে বজ্রযোগিনী স্কুলের দিকে। অন্য দুটি গ্রামের ভেতর। রাস্তা ছেড়ে গ্রামের পথে নেমে এলে মূল গ্রামের রূপ বোঝা যায়। গ্রামটা একটু অন্যরকম। এখানে কোনো ধানি জমি নেই। সব সবজি ক্ষেত। মাঝে মাঝে দেখা যায় কাকাতুয়া। ক্ষেতের পাশেই যার যার বাড়ি। বাড়িগুলোও একেবারেই গ্রামের বাড়ির মতো নয়। কিছুটা বাংলো ধাঁচের বাড়ি। গ্রামের ভেতর এ ধরনের বাড়ি একটু অদ্ভুত। বোঝা যায় বাড়ির মানুষগুলো শহরের সঙ্গে জড়িত।

গ্রামটি এক সময় ছিল হিন্দুপ্রধান গ্রাম।

১. ভাগ্য ভালো থাকলে এই নদীতে দেখতে পাবেন শুশকের লাফালাফি

২. রা ।ঘাটে চোখে পড়বে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

৩. ধ্বংসের মুখে প্রাচীন মন্দির

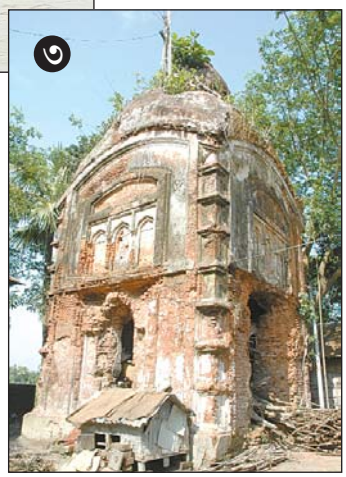

বেশ কয়েকটা মন্দির চোখে পড়ে। যেগুলো এখন পোড়াবাড়িতে রূপ নিয়েছে। এমনই একটি প্রাচীন বাড়িকে ডাকঘর বানানো হয়েছে। আর একটি বাড়িকে ব্যবহার করা হচ্ছে মুরগির খামার হিসেবে। তবে বেশির ভাগ বাড়িই ব্যবহারের অযোগ্য।

৮.৩০ : গ্রামের রাস্তায় দেখা হলো বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভুঁইয়ার সঙ্গে। তিনি জানান, 'এটা আসলে বজ্রযোগিনী গ্রাম নয়। বজ্রযোগিনী হলো একটা ইউনিয়ন পরিষদ। এই ইউনিয়নের মধ্যে সাতাশটি পাড়া আছে। একেকটি পাড়া একেকটি গ্রাম। তা সত্ত্বেও সবাই একে বজ্রযোগিনী গ্রাম নামেই চিনে।'

তিনি আরো জানান, ইতিহাসের দিক থেকে এই গ্রামটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জন্ম বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের। অনেকে একে অতীশ দীপঙ্করের গ্রাম হিসেবেও চেনে। এ ছাড়াও এখানে জন্মগ্রহণ করেন গণিতবিদ সোমেন বোস, খ্যাতিমান সংবাদ পাঠক দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা স্যানাল, বংশীবাদক আব্দুর রহমানসহ আরো অনেকে।

কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে গ্রামটি। এখানে বলা মুশকিল বিখ্যাত মানুষের জন্য গ্রাম খ্যাত না গ্রামের জন্য মানুষ বিখ্যাত। তবে এটুকু বলা যায় গ্রাম মানুষকে অনেক কিছু শেখায়, কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। তার প্রমাণ এই বজ্রযোগিনী গ্রাম।

৯.০০ : হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিশাল পাড় বাঁধানো পুকুর আর সারি সারি নারকেল গাছ শোভা পাচ্ছে স্কুলের সামনে। কথা হলো স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ মজিবুর রহমান হাওলাদারের সঙ্গে। তিনি এই গ্রামেরই ছেলে। বজ্রযোগিনী গ্রামের নামকরণ নিয়ে বলেন 'এর নামকরণ নিয়ে কিছুটা মতান্তর থাকলেও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শোনা একটি ইতিহাস রয়েছে। সম্রাট শেরশাহের যুদ্ধের সময় পরাজিত এক হিন্দু রাজা তার এক কন্যাসহ এই গ্রামে আসেন। তার কন্যার নাম ছিল বরজ। পরবর্তীতে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বরজ সন্ন্যাসিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে একদিন খুব ভোরে তার আনুসারীদের নিয়ে এখান থেকে ৬/৭ কি.মি. দূরে মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী তীরে স্নান করতেন। পরবর্তীতে সেই ঘাটের নামকরণ করা হয় যোগিনীঘাট। ধারণা করা হয়, বরজ নামটি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে বজ্র হয় এবং পরবর্তীতে গ্রামের নাম হয় বজ্রযোগিনী।'

বজ্রযোগিনী স্কুলটি এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন স্কুল। ১৮৮৩ সালের নবেম্বর মাসে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন তৎকালীন জমিদার। ৫৬৫ জন ছাত্র নিয়ে এই স্কুলটি যাত্রা করে। প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে জানা যায়, গ্রামে শিক্ষিতের হার প্রায় ৬০%।

১০.০০ বৈশাখ মাস। ক্ষেতের দু'পাশে সবজির মাচা। মধ্য গ্রামের মেঠো পথ। প্রচন্ড বাতাস। তার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কিছু পুকুর, ডোবা। মুন্সীগঞ্জকে বলা হয় পানির জেলা। তার প্রমাণ এই গ্রামের পুকুর ও ডোবার আধিক্য। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে জড়িত তার প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে। এখানকার মূল ফসল হলো সবজি, পান ও ছোট মাছ। সবজির মধ্যে আলু প্রধান। তাছাড়াও কুমড়া, শসা, করলা ইত্যাদি উৎপাদন হয়। তবে এখানকার মানুষ পুরোপুরি সবজি চাষে নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক বাড়ি থেকে কেউ না কেউ বিদেশে থাকে। সৌদি আরব, গ্রিস, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে পাঠানো অর্থে সংসার চলে। দেখা যায়, বাড়ির ছেলেটি একটু বড় হয়ে উঠলেই তাকে আর কলেজে না পাঠিয়ে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে গ্রামবাসী মনির বলেন, 'আমাদের এখানে আলু, পান ও অন্যান্য সবজি চাষ হয় ঠিকই। সেই সঙ্গে এখানে আছে প্রচুর পুকুর ও ডোবা। বৃষ্টি বেশি হলেই জমিতে পানি এসে যায়। গত বন্যায় সম্পূর্ণ গ্রামই ছিল পানির নিচে। প্রতি বছর কিছু না কিছু হচ্ছে। যার জমি ছাড়া আর কিছু নেই সে খাবে কি? ফলে সবাই বিদেশগামী হচ্ছে।'

দুই দিন আগে হয়ে যাওয়া শিলাবৃষ্টিতে চাষীর বেশির ভাগ সবজিই নষ্ট হয়ে গেছে। যে ক্ষেত থেকে আর কয়েক দিন পর ৫০০ জালি কুমড়া তুলতে পারতো, সেখানে সে পাঁচটায়ও তুলতে পারবে কি না সন্দেহ। কুমড়া চাষী মাজলু আক্ষেপ করে বললো, বিদেশে না গিয়ে উপায় কি আমাদের!

১১.০০ : রিকশায় ১৫ মিনিটের পথ। পৌঁছে গেলাম মনীষী অতীশ দীপঙ্করের বাড়িতে। সেখানে এখন কোনো বাড়ি নেই। ফাঁকা একটা জায়গায় রয়েছে অতীশ দীপঙ্কর স্মৃতিস্তম্ভ। জানা যায়, অতীশ দীপঙ্করের আগে নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। ৯৮২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭২ বছর বয়সে ১০৫৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখানেই নির্মিত হতে যাচ্ছে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। জমি দখলে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানান স্কুল কমিটির সভাপতি তমিজউদ্দিন হাওলাদার। তিনি আরো জানান, এখানে অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি টাকা চলে এসেছে। শিগগিরই এর কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। অতীশ দীপঙ্করের এটিই বাস্তুভিটা। দুটি কুকুর পাহারা দেয় তার স্মৃতিস্তম্ভ।

১১.৩০ : অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস। ওই সময় তাঁর মতো জ্ঞানী লোক এ উপমহাদেশে কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন বিশাল সম্পত্তির মালিক। ছিল প্রচুর জমি-জমা। কিন্তু এখন এর

†KŠZnjx gvb‡li wf‡o Pj‡Q GbwUwfÕi ïwUs

wKQ `i ci ci cv‡bi eiR- MvgwU‡Z ˆewPÎ¨ G‡b‡Q

বেশির ভাগই স্থানীয়রা দখল করে নিয়েছে। কথাগুলো বলছিলেন স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি মোকলেছুর রহমান ঢালী। অবৈধ দখলের জন্য স্থানীয়রা দীপঙ্করের জমি-জমা নিয়ে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে অনাগ্রহী।

দুপুর ১২.০০ : অতীশ দীপঙ্করের বাড়ি থেকে আবার আমরা রওয়ানা হলাম আটপাড়ার কবিরাজ কুটিরের দিকে। আমাদের রিকশা এগিয়ে চলছে। হঠাৎ বিশাল দীঘি দেখে আমরা রিকশা থেকে নেমে পড়লাম। অদ্ভুত সুন্দর এই দীঘি। রিকশাওয়ালা শাহেদ আলী আমাদের জানালেন, এই দীঘির নাম সুখবাসপুর দীঘি। এই দীঘিতে বর্ষাকালে প্রচুর পাখি আসে। দীঘিতে মাছ চাষও করা হয়। হঠাৎ একটা চিল একটি মাছ তুলে নেয়ায় আমাদের কথার তাল কেটে গেল। অদ্ভুত সুন্দর ছিল সেই দৃশ্য।

১২.৩০ : শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র মান্না এখানকার বিখ্যাত কবিরাজ। শুধু এলাকার লোকই নয়, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদি দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে এখানে চিকিৎসা নিতে। এখানে সব রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়।

কবিরাজ সরেন্দ্র চন্দ্র ৬০ বছর ধরে কবিরাজি করেন। কলকাতা শ্রদ্ধা সমাজ থেকে তিনি পাস করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে তিনি পরীক্ষায় প্রথম হন।

তার নিজের ঔষুধি গাছের বাগান রয়েছে। যেখানে রয়েছে বেরেলা, ভেন্না, কানাইলরি, বহেড়া, হরিতকি, কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তিনি জানান, কৃষ্ণচূড়া দিয়ে পাচন তৈরি হয় আর এটি বাতের জন্য ভালো।

তবে গত বছরে বর্ষায় বাগানের প্রায় সব গাছই মরে গেছে। ফলে এখন তাকে সব গাছই ঢাকার মৌলভীবাজার থেকে কিনে আনতে হয়। তবে ইতিমধ্যেই তিনি তার বাগানে নতুন করে কিছু ওষুধি গাছ লাগিয়েছেন।

১.০০ : কবিরাজ বাড়ি থেকে বের হলাম। রিকশা নিয়ে গ্রামটা একটু ঘুরে বেড়াবো।

আমরা যাচ্ছিলাম তিনগিরি পাড়ার ওপর দিয়ে। এখানে প্রচুর ছোট ছোট পুকুর আর রয়েছে অনেক প্রাচীন বাড়ি। জানা গেল, এগুলো সবই আগে হিন্দুবাড়ি ছিল। কারুকার্যখচিত আর নয়ন জুড়ানো শিল্পকর্মে গড়ে তোলা এসব প্রাচীন বাড়ি আজ জীর্ণদশা সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা কেউ নিচ্ছে না।

রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে দেখলাম স্কুল ছুটি

cvq 200 eQ‡ii civZb †R †K D"P we`¨vjq

mKv‡j wfo R‡g hvq KweivR ewo‡Z

হয়ে গেছে। কিশোর-কিশোরীদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে রাস্তা।

২.৩০ : রাস্তা ধরে হাঁটার সময় হঠাৎ কানে এলো হিন্দি গানের সুর। বাড়িটিতে ঢুকে পড়লাম। জানা গেল, এই পরিবারের বড় ছেলে সৌদি আরব থাকেন ৫ বছর ধরে। পরিবারের বাবা জনতা ব্যাংকের সিকিউরিটি। তিনি জানান তার ২ ছেলে, ৩ মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন।

তিনি জানান, তার মূলত আয়ের উৎস তার ছেলে। অল্প কিছু জমি রয়েছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। ছেলে বিদেশ যাওয়ার পরই পরিবারের কিছুটা আর্থিক উন্নতি হয়েছে।

৩.০০ : মোটামুটি শান্ত চারদিক। চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি। এমন সময় হইচই শোনা গেল। দেখলাম মানুষজনের বেশ ভিড়। জানা গেল, এখানে এনটিভির শুটিং চলছে। শুটিং দেখার জন্য এতো ভিড়। কাছে এগিয়ে গেলাম। একজন বললো, এই দৃশ্যটা আবার করতে হবে। ক্ষেতের ভেতর ঢুকতে হবে। শুনে উপস্থাপিকা রাগের সঙ্গে বললো, ‘এনটিভির অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে কোথায় কোথায় যেতে হবে?’ গ্রামের মানুষ শহরে উপস্থাপিকার কথায় হেসে উঠলো।

শুটিং শেষে এগিয়ে গেলাম। প্রযোজক পারভেজ চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলাম কেন গ্রামে এসেছেন? তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘গ্রামবিষয়ক একটি ডকুমেন্টারি করার জন্য। মূলত এর মাধ্যমে গ্রামকে আবার ফিরিয়ে আনা। গ্রামের পরিবর্তনগুলো তুলে ধরা।’ গ্রামের মানুষকে দেখলাম শুটিং সম্পর্কে বেশ আগ্রহ। কয়েকজন জানতে চাইলো কবে দেখাবে? ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চা উপস্থাপিকা মলির পাশে ঘোরাঘুরি করছে। ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাপলার কাছে থেকে জানা গেল, এই গ্রামের মানুষরা শুটিংয়ে খুবই সাহায্য করছে। কোথায় কোন নিদর্শন, কোন বিখ্যাত লোকের বাড়ি কোথায় তা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

৪.৪৫ : বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রচলন আছে বৈঠকি গানের। এছাড়াও বাউল, মুর্শিদী গানের প্রভাবও কম না। প্রায় দিনই সন্ধ্যায় এখানে গানের আসর বসে। সারা দিন কাজের শেষে সবাই গানের মাধ্যমে বিশ্রাম খোঁজে। বজ্রযোগিনী গ্রামের একমাত্র বিনোদন এই গ্রাম। গ্রামের প্রসিদ্ধ বাউল আলী আকবর ভাণ্ডারী ও তার দল গানের আসর বসায়। ঢোল না থাকলেও শুধু স্টিলের কলসি দিয়ে চমৎকার সুর তুলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুর্শিদী গান ধরে গায়ক।

‘দয়াল আমারে, এই পথ দিয়া আসবেরে
আমি সদাই থাকি পথের দিকে চাইয়ারে।’

এরই মধ্যে দেখলাম এক লোক পুরো গানের আসরটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ডিং করছে।

গান চলছে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শেষ বিকেলের রোদ আর গান গ্রামের চিত্রই পরিবর্তন করে দিয়েছে। হিন্দি গানের যুগে মুর্শিদী গানের কথা মানুষ ভুলেই গেছে। এই গান হারিয়ে যাওয়া গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়।

৬.০০ : গানের আসর চলছে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছে। বেরিয়ে পড়লাম আবার গ্রামের পথে। বিকেল আর সন্ধ্যার মুখে গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম সবাই ঘরে ফিরছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাঠে ছেলেরা খেলছে।

বাংলাদেশের অনেক গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম বজ্রযোগিনী। ঐতিহ্য আর মনোরম প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে জেগে আছে বজ্রযোগিনী গ্রাম। প্রাচীন স্থাপত্যের এই গ্রাম প্রমাণ করে মানুষের মূল শিকড় তার গ্রাম। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলে গ্রাম।

ছবি : সালাহউদ্দিন টিটু